বাইওকেমিক কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা ও থেরাপিউটিক্স

ডাঃ বিজয়কুমার বসু

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবজেকটিভ লক্ষণ	১৩
আহার সম্বন্ধে বিধি ও নিষেধ	২৮
ঔষধসমূহ সূক্ষ্ম মাত্রায় ব্যবহৃত হইবার কারণ ...	১৩
ঔষধের পর্যায়, অনুপর্যায় ও মিশ্রণ ব্যবহার ...	১৮
ঔষধের পুনঃ প্রয়োগকাল	১৮
ঔষধের মাত্রা	১৬
ঔষধের মিশ্রণ বিধি	১৯
ঔষধের বাহ্য ব্যবহার	২৬
চূর্ণাকারে	২৬
উষ্ণ জল সহ	২৬
গ্লিসারিন, ভেসেলিন ও ঘৃত সহ	২৬
পুলটিস সহ	২৬
কিরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়	২০
কিরূপে ধাতব লবণসমূহ গৃহীত হয়	১১
কিরূপে চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়	১৫
ক্লিনিক্যাল লক্ষণ	১৩
গ্রন্থকারের নিবেদন	৪
চিকিৎসার উদ্দেশ্য	১৩
চূর্ণ অথবা তরল ব্যবহার করা কর্তব্য	১৪
চূর্ণ ও ট্যাবলেটের পার্থক্য	১৬
পরিচায়ক লক্ষণ	১৩
পরিশিষ্ট	২৭৬
পিচকারি প্রয়োগ	২৭
পীড়ার কারণ	১২
পুরাতন পীড়ায় ঔষধের সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম মাত্রা ...	১৪
প্লাসিবো, ফাইটাম, নাইহিলাম ইত্যাদি কাহাকে বলে ...	১৮
বাইওকেমিক চিকিৎসার ইতিবৃত্ত	৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাইওকেমিক জোলাপ	২৪
বাইওকেমিষ্ট্রীর উৎপত্তি	৯
বাইওকেমেস্ট্রী ও হোমিওপ্যাথির প্রভেদ	১০
মিশ্রণ সঙ্গত কিনা	১৯
মুখের আকৃতি দেখিয়া ঔষধ বা রোগ নির্ণয় ...	২৭
রোগ নির্ঘন্ট	২৭৭
রোগী বিবরণী	২৭২
রোগী-লিপি প্রস্তুত	২৯
লক্ষণ	১৩
শক্তি, মাত্রা, পর্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার ও ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ সম্বন্ধে শেষ কথা	২১
শক্তি মীমাংসা	২১
শরীরে কোন দ্রব্য কি পরিমাণে আছে	১১
সদা ব্যবহৃত শক্তিসমূহের তালিকা	২৪
সাধারণ লক্ষণ	১৩
সাবজেকটিভ লক্ষণ	১৩
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিকাম	৩১
ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকাম	৪৯
ক্যাল্কেরিয়া সালফুরিকাম	৭৭
ফেরাম ফসফরিকাম	৮৭
কেলি মিউরিয়েটিকাম	১১৩
কেলি ফসফরিকাম	১৩৮
কেলি সালফুরিকাম	১৬০
ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকাম	১৭১
নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম	১৮৬
নেট্রাম ফসফরিকাম	২১৫
নেট্রাম সালফুরিকাম	২২৮
সাইলিসিয়া	২৪৮

বাইওকেমিক
কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা

বাইওকেমিস্ট্রীর উৎপত্তি

বাইয়স (bios) একটি গ্রীক শব্দ; ইহার অর্থ লাইফ (life) বা জীবন। কেমিস্ট্রী (chemistry) শব্দের অর্থ রসায়ন। সুতরাং বাইওকেমিস্ট্রী শব্দের অর্থ জীবন-রসায়ন বা জৈব রসায়ন।

আমাদের শরীর সাধারণতঃ অর্গ্যানিক অর্থাৎ জান্তব এবং ইন-অর্গ্যানিক অর্থাৎ ধাতব—এই দুই প্রকার পদার্থের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অস্থি, মজ্জা, মাংস প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নির্মাণ করিয়া জীবনকে পুষ্ট, বর্ধিত ও রক্ষা করিতেছে। জীবিত দেহে অহরহ ধাতব ও জান্তব এই উভয় প্রকার পদার্থের আবশ্যকানুযায়ী আদান-প্রদানের ফলেই জীব সুস্থ থাকে। **জীবিত দেহে কখনও জান্তব পদার্থের অভাব হয় না,** কেবল ধাতব পদার্থেরই অভাব হইয়া থাকে। যখন কোনও ক্রমে এই ধাতব পদার্থের অভাব হয়, তখন যে যে ধাতব পদার্থের অভাব হইয়াছে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত জান্তব পদার্থনিচয়ও অকার্যকরী হইয়া উঠে। ঐ অভাবগ্রস্ত ধাতব পদার্থসমূহ ঔষধরূপে আভ্যন্তরীণ গ্রহণের ফলে অভাবের পূরণ হয় এবং শারীরিক বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়। জীবিতাবস্থায় এই যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতেছে, ইহাই **জৈব রসায়ন** নামে অভিহিত।

বাইওকেমিক চিকিৎসার ইতিবৃত্ত

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একখানি জার্মানদেশীয় সংবাদপত্রে জনৈক বহুদর্শী চিকিৎসক প্রকাশ করেন—"মানব শরীরের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ সমূহই উৎকৃষ্ট ঔষধ।" ইহার কয়েক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকাতেই অপর একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক একটি প্রবন্ধে লিখেন, "মনুষ্য শরীরের যে যে স্থান যে যে অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত, সেই সেই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থসমূহই ঐ সমস্ত স্থানে কার্যকরী।" ইহার পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর অন্তঃপাতী ওল্ডেনবার্গ নিবাসী ডাক্তার মেডি শুসলার "লিপজিগ হোমিওপ্যাথিক গেজেট" নামক একখানি

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেন যে, তিনি এক বৎসর ধরিয়া রোগারোগ্যের জন্য এই সমস্ত টিশু ঔষধ পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন।

উক্ত প্রবন্ধ বাহির হইবার পর জনৈক চিকিৎসক উহার প্রতিবাদ করিয়া মহাপ্রাণ শুসলারকে তাঁহার পরীক্ষিত নূতন চিকিৎসা-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি উক্ত পত্রিকায় "অ্যাব্রিজড সিস্টেম অফ থেরাপিউটিক্স" (Abridged System of Therapeutics) নামক এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেন। সাত বারে ঐ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হয়। আমেরিকার এইচ সি জি লুটিস নামক জনৈক চিকিৎসক "হোমিওপ্যাথিক নিউজ" (Homoeopathic News) নামক পত্রিকায় উক্ত জার্মান প্রবন্ধটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ বাহির হইবার পর চতুর্দিকে ইহা লইয়া তীব্র সমালোচনা চলিতে থাকে। এই সময় আমেরিকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কনস্ট্যান্টাইন হেরিং টিশু রেমেডি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি নিজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শুসলারের প্রবন্ধগুলিও সন্নিবেশিত করেন এবং ইহার আবিষ্কারক মহাপ্রাণ শুসলারকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া জনসাধারণকে প্রচারিত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে অনুরোধ করেন। জনসাধারণের আগ্রহে অত্যল্পদিনের মধ্যেই পুস্তকখানির কয়েক সংস্করণ বিক্রয় হইয়া যায়। ইহার পর, আমেরিকা, জার্মানী, স্কটল্যাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এই নূতন মতের নূতনত্ব দূর করিয়াছেন। এখন বাইওকেমিক চিকিৎসার বিষয় পল্লীগ্রামের লোকেরাও অবগত আছেন।

বাইওকেমিস্ট্রী ও হোমিওপ্যাথির প্রভেদ

কেহ কেহ বলেন যে, বাইওকেমিস্ট্রী ও হোমিওপ্যাথি একই পদার্থ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। উভয় চিকিৎসার প্রণালীও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। **বাইওকেমিকের মূলসূত্র হইতেছে—অভাবের পূরণ করা;** অর্থাৎ যখন যে বস্তুর অভাব বা স্বল্পতা লক্ষিত হইবে, তখন ঠিক সেই পদার্থের দ্বারা উক্ত অভাব বা স্বল্পতা পূরণ করা। অভাবের পূরণ হইলে রোগলক্ষণেরও শান্তি হইবে। কিন্তু হোমিওপ্যাথির মূলসূত্র হইতেছে—"সমঃ সমং শময়তি", অর্থাৎ সুস্থ শরীরে যে ঔষধ সেবন দ্বারা যে যে লক্ষণ উৎপন্ন হয়, পীড়িত দেহে সেই সেই লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সূক্ষ্ম মাত্রায় সেই ঔষধ প্রদান করিলে সেই সকল লক্ষণ দূরীভূত হইয়া পীড়া আরোগ্য হয়। সুস্থ শরীরে কোন্ কোন্ নিয়মে কি প্রকার মাত্রায় ঔষধ সেবন করিলে লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, তাহা ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিলে হ্যানিম্যানের অর্গ্যানন পাঠ করা কর্তব্য।

শরীরে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ আছে

আমাদের শরীরে দ্বাদশটি ধাতব লবণ আছে। ঐ ধাতব লবণ–সমূহের নাম ১। ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিকাম (calcarea fluoricum); ২। ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকাম (calcarea phosphoricum); ৩। ক্যাল্কেরিয়া সালফুরিকাম (calcarea sulphuricum); ৪। ফেরাম ফসফরিকাম (ferrum phosphoricum); ৫। কেলি মিউরিয়েটিকাম (kali muriaticum); ৬। কেলি ফসফরিকাম (kali phosphoricum); ৭। কেলি সালফুরিকাম (kali sulphuricum)। ৮। ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকাম (magnesia phosphoricum); ৯। নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম (natrum muriaticum); ১০। নেট্রাম ফসফরিকাম (natrum phosphoricum); ১১। নেট্রাম সালফুরিকাম (natrum sulphuricum); ১২। সাইলিসিয়া (silicea)। এই দ্বাদশটি ধাতব লবণ ভিন্ন আরও কয়েকটি ধাতব লবণ শরীরে আছে। কিন্তু ঔষধার্থে তাহাদের কোনও প্রয়োজন হয় না। মহাপ্রাণ শুসলার তাঁহার শেষ জীবনের অভিজ্ঞতায় ক্যাল্কেরিয়া সালফুরিকামের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। তিনি ঔষধের পরিবর্তে "নেট্রাম ফস" ও "সাইলিসিয়া" ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা "ক্যাল্কে-সালফের" দ্বারা যখন উপকার পাই, তখন উহা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমাদের শরীর ধ্বংস হইলে জান্তব পদার্থসমূহ ও জল নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ধাতব পদার্থ থাকিয়া যায়। আর ধাতব পদার্থগুলি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

জান্তব পদার্থ সকর ধাতব পদার্থের সাহায্য ভিন্ন কার্যকরী হয় না, একথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। জীব শরীরে $\frac{২}{১০}$ অংশ জান্তব পদার্থ আছে। ঐ জান্তব পদার্থ সকল চর্বি, অণ্ডলালা, জিলেটিন কার্বনেট, ও ফাইব্রিনরূপে দেহে বর্তমান আছে। অবশিষ্ট $\frac{৮}{১০}$ অংশের মধ্যে $\frac{৭}{১০}$ অংশই জল এবং $\frac{১}{১০}$ অংশ মাত্র ধাতব পদার্থ। ঐ $\frac{১}{১০}$ অংশ ধাতব পদার্থই আমাদের পূর্ববর্ণিত দ্বাদশটি ঔষধ। ধাতব লবণের অংশ যদিও স্বল্প, কিন্তু উহাদের ক্রিয়া অতিশয় বিস্তৃত। আর ইহারাই জান্তব পদার্থসমূহকে কার্যকরী করিয়া তুলে।

কিরূপে ধাতব লবণসমূহ গৃহীত হয়

নিশ্বাস-পথে বায়ু গ্রহণ, আহার, পানীয় সূর্যকিরণাদির দ্বারা ধাতব লবণসমূহ শরীরাভ্যন্তরে গৃহীত হইয়া থাকে। ভুক্ত ও পীত দ্রব্য সকল লালা, পাকস্থলী-রস, ক্লোম-রস প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ রক্তরূপে পরিণত হয়। পরে এই

রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া নিশ্বাস দ্বারা গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে বিশোধিত হইয়া ধমনী ও কৈশিকা নাড়ীর সাহায্যে সর্বাঙ্গে পরিচালিত হইয়া প্রত্যেক টিশুকে তাহার অভাবানুযায়ী ধাতব লবণ সরবরাহ করিয়া থাকে।

জীব শরীরের ন্যায় বৃক্ষ লতাদিও মৃত্তিকা, জল, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা ধাতব লবণসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি কোনও কারণে ভূমির উর্বরতা-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, অথবা উপযুক্ত আলো বা বাতাসের অভাব হয় এবং যদি তাহা শীঘ্র পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে বৃক্ষ লতাদি শীর্ণ হইয়া যায়। আমরা যদি এই সমস্ত অপুষ্টিকর বৃক্ষের ফল, শীর্ণ শাকপাতা ইত্যাদি ভক্ষণ করি, তাহা হইলে আমরাও বৃক্ষলতাদির ন্যায় অল্প পরিমাণে ধাতব লবণ গ্রহণের ফলে শীর্ণ হইয়া পড়িব। এজন্য সর্বদা খাদ্যদ্রব্যাদি বিচার করিয়া গ্রহণ না করিলে অসুস্থ হইয়া পড়িতে হয়।

পীড়ার কারণ

পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, আমাদের শরীরে কখনও জান্তব পদার্থের অভাব হয় না—ধাতব পদার্থেরই অভাব হইয়া থাকে। যদি কখনও কোন কারণে ধাতব পদার্থের অভাব হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ধাতব পদার্থের অভাব হইয়াছে সেই ধাতব পদার্থের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত কোনও জান্তব পদার্থ কার্যকারিতার অভাবে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী হইয়া উঠে এবং প্রকৃতি এই অনিষ্টকারী পদার্থকে দেহ হইতে বহির্গত করিয়া দিতে চেষ্টা করে। কিম্বা কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করিয়া শরীরে ধাতব পদার্থের অভাব জ্ঞাপন করে। **এই অভাবসূচক লক্ষণসমূহই পীড়া নামে অভিহিত।**

আমাদের শরীর সর্বদাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং পানাহারাদি দ্বারা আমরা আবার সেই ক্ষয়ের পূরণ করিতেছি। যদি কোনও কারণে পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলাবশতঃ ভুক্তদ্রব্যের সমীকরণ না হয়, তাহা হইলে এই ধাতব লবণের অভাববশতঃ বিবিধ পীড়া হইয়া থাকে। আবার যখন যে দ্রব্যটির অভাব হয়, তখন যদি সেই দ্রব্যটির অভাব পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে ঐ পদার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আর একটি ধাতব লবণেরও অভাব হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমশঃ পীড়া জটিল আকার ধারণ করে।

কোষসমূহের অপ্রকৃতাবস্থাই পীড়া। মহাপ্রাণ শুসলার পরীক্ষার দ্বারা উপলব্ধি করিলেন যে, যে যে কোষ পীড়িত হয় এবং সেই সেই পীড়িত কোষের যে যে ধাতব লবণ অত্যাবশ্যক, তাহা যদি সূক্ষ্ম মাত্রায় আভ্যন্তরীণ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে পীড়িত কোষসমূহ পুনরায় সুস্থ হইয়া কার্যক্ষম হইয়া উঠে।

চিকিৎসার উদ্দেশ্য

ইতঃপূর্বে "পীড়ার কারণ" অধ্যায়ে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রক্তে বা কোষে ধাতব-লবণসমূহের অভাবই পীড়া এবং ঐ অভাবের পূরণই প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার উদ্দেশ্য। যেমন ক্ষুধা পাইলে যতক্ষণ না প্রকৃত আহার্য পড়ে ততক্ষণ অন্য কোন দ্রব্যের দ্বারাই জঠরানলের শান্তি হয় না, তেমন চিকিৎসার উদ্দেশ্যও অভাবগ্রস্তের অভাব পূরণ করা। লক্ষণ দ্বারাই অভাব জানা যায় এবং তাহাই একমাত্র পন্থা।

লক্ষণ (symptom)

সুস্থ শরীরের বিকৃতি বা ঔষধ সেবনজনিত অস্বাভাবিক অবস্থাকে লক্ষণ বলে।

সাধারণ লক্ষণ (generic symptom)

যে সমস্ত লক্ষণ অনেকগুলি ঔষধে দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে জেনারিক বা সাধারণ লক্ষণ বলে।

পরিচায়ক লক্ষণ (characteristic symptom)

কোনও একটি ঔষধের যে লক্ষণ বা লক্ষণসমূহ কেবল সেই ঔষধেই দৃষ্ট হয়, তাহাকে সেই ঔষধের ক্যার‍্যাকটারিস্টিক বা বিশেষ অথবা পরিচায়ক লক্ষণ বলে।

ক্লিনিক্যাল লক্ষণ (clinical symptom)

যে লক্ষণ সকল ঔষধের পরীক্ষাকালীন (proving) প্রকাশ পায় নাই, অথচ যে লক্ষণসমূহ কোন ঔষধের দ্বারা দূরীভূত হয়, তাহাকে সেই ঔষধেরই অভিজ্ঞতামূলক বা ক্লিনিক্যাল লক্ষণ বলে। ক্লিনিক্যাল লক্ষণ সম্বন্ধে কেবল সত্যবাদী বিদ্বান চিকিৎসকের কথার উপর নির্ভর করা যায়।

সাবজেকটিভ লক্ষণ (subjective symptom)

যে সকল রোগলক্ষণ রোগী নিজেই মাত্র অনুভব করিতে পারে এবং না বলিলে চিকিৎসক যাহা অনুভব করিতে পারেন না, তাহাকে সাবজেকটিভ লক্ষণ বলে।

অবজেকটিভ লক্ষণ (objective symptom)

যে সকল রোগলক্ষণ চিকিৎসক রোগীর সাহায্য ভিন্ন নিজে রোগী পরীক্ষা করিয়াই বুঝিতে পারেন, তাহাদিগকে অবজেকটিভ লক্ষণ বলে।

ঔষধসমূহ সূক্ষ্ম মাত্রায় ব্যবহৃত হইবার কারণ

ঔষধসমূহ কোনক্রমে রক্তে মিশ্রিত হইতে না পারিলে কার্যকরী হয় না। রক্তস্রোতে মিশ্রিত হইবার জন্য কৈশিকা-নাড়ীসমূহই (capillary) একমাত্র পথ। কিন্তু কৈশিকা-নাড়ীসমূহ এত ক্ষুদ্র যে, এক গ্রেনের সহস্রাংশের একাংশ ভিন্ন উহার

ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ঔষধ যদি স্থূল হয়, তাহা হইলে উহা পাকস্থলীতে যাইয়া খাদ্যাদির ন্যায় পরিপাক হইয়া (অবশ্য খাদ্যাদি হইতে সুক্ষ্ম বিধায় উহা অপেক্ষা অল্পসময়ে পরিপাক হয়) কৈশিকা-নাড়ী দিয়া রক্তে মিশ্রিত হয়। স্থূল ঔষধ প্রয়োগের ফলে তিনটি প্রধান অনিষ্ট দৃষ্ট হয়।

১। স্থূল ঔষধ পরিপাক হইয়া রক্তে মিশ্রিত হইতে বহু বিলম্ব হয়। ২। পীড়িত শরীরে পরিপাকযন্ত্রসমূহ স্বভাবতঃ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং এই স্থূল ঔষধকে সুক্ষ্মরূপে পরিণত করিতে পাকস্থলী আরও দুর্বল ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। ৩। রুগ্ন শরীরে পরিপোষণের অভাবে পাকস্থলীর অভ্যন্তরে নানাপ্রকার অকার্যকরী পদার্থ সঞ্চিত থাকিয়া শোষণ ক্ষমতা বহুলাংশে নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় স্থূল ঔষধের কতটুকু যে কার্যোপযোগী হইল, তাহা নিরূপণ করা যায় না। এই সমস্ত কারণে হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক চিকিৎসকগণ ঔষধসমূহ সূক্ষ্ম মাত্রায় ব্যবহার করেন। অন্য মতের চিকিৎসকের রোগী আরোগ্য হইবার পরও এইজন্য দুর্বল হইয়া পড়ে।

পুরাতন পীড়ায় ঔষধের সুক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম মাত্রা

দীর্ঘদিন ধরিয়া রোগ ভোগ করিবার ফলে পরিপোষণাভাবে কোষসমূহ অত্যধিকরূপে পীড়িত হয় এবং পীড়িত কোষসমূহের চতুস্পার্শ্বে অনেক পরিমাণে অকার্যকরী পদার্থসমূহ সঞ্চিত হইয়া তত্রত্য বিধানসমূহকে (tissue) সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। এই সঙ্কোচনের ফলে আশোষণ ক্রিয়াও ভালরূপে সম্পাদিত হয় না। সুতরাং পুরাতন পীড়া আরোগ্যকল্পে অতিশয় সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধ প্রযুক্ত না হইলে শারীরিক রক্তে তাহা গৃহীত হয় না। ঔষধ যতই সূক্ষ্ম হইবে, শক্তিও তত উচ্চ হইবে। সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম মাত্রার ঔষধই উচ্চতর ও উচ্চতম শক্তির ঔষধ।

চূর্ণ অথবা তরল ব্যবহার করা কর্তব্য

মাত্র দুইটি উপায়ে ঔষধসমূহ সূক্ষ্মরূপে ব্যবহার করা যায়। প্রথমতঃ—সুরাসারে, দ্বিতীয়তঃ—দুগ্ধশর্করায়। বাইওকেমিক ঔষধসমূহ দুগ্ধশর্করায় প্রয়োগ করাই বিধেয়; আর বাইওকেমিক ঔষধের আবিষ্কারক ডাঃ শুসলার, ডাঃ চ্যাপম্যান, ডাঃ কারে প্রভৃতিও চূর্ণ বা ট্যাবলেট অর্থাৎ চাক্তিতে (tablet) ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুরাসারে ব্যবহার করিবার অন্তরায় কি কি এখন তাহাই বলিতেছি।

১। বাইওকেমিক ঔষধসমূহ প্রথমাবস্থায় সুরাসারের সহিত দ্রবীভূত করা যায় না। ৬x পর্যন্ত চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া পরে সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করা যায়। অথচ ১x হইতে ৬x পর্যন্ত শক্তি অনেক সময়েই ব্যবহৃত হয়।

২। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদের শরীরে সুরাসারের ন্যায় কোন দ্রব্যেরই অস্তিত নাই; কিন্তু দুগ্ধশর্করার অস্তিত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব সুরাসার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে।

৩। সুরাসার উত্তেজক, কিন্তু দুগ্ধশর্করা অনুত্তেজক এবং খাদ্য বিশেষ।

৪। সুরাসার দ্বারা প্রস্তুতীকৃত ঔষধ দুগ্ধশর্করা দ্বারা প্রস্তুত করা ঔষধ অপেক্ষা অনেক কম দিন স্থায়ী হয়। চুর্ণ ঔষধ বহু বৎসরেও নষ্ট হয় না এবং তাহার ভেষজ ক্রিয়াও অব্যাহত থাকে; আর তরল ঔষধে বহু বৎসর না থাকিলেও ২।৩ বৎসর অনায়াসে থাকে বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্পিরিট উবিয়া যায় বলিয়া ভেষজগুণের তারতম্য হওয়া আশ্চর্য নহে।

কিরূপে চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞানার্জন করিতে হইলে ফার্মাকোপিয়া (pharmacopoeia) নামক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইবে। যাহা হউক, চূর্ণ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা প্রয়োজন।

বাইওকেমিক ঔষধসমূহ দশমিক নিয়মানুসারে প্রস্তুত। এক ভাগ মূল ঔষধের সহিত ৯ ভাগ দুগ্ধশর্করা মিশ্রিত করিলে ১x চূর্ণ প্রস্তুত হয়। প্রথমে ক্রমের ঔষধে দশ ভাগের এক ভাগ মূল ঔষধ থাকে। পরবর্তী ক্রমের ঔষধে তৎপূর্ববর্তী ক্রমের দশ ভাগের এক ভাগ ক্রমের ঔষধ থাকে। "x" বা "দ" চিহ্ন দশমিক ক্রম বিজ্ঞাপিত করে। ডাঃ হেরিং সর্বপ্রথমে এই নিয়ম প্রকাশ করেন। ঔষধ প্রস্তুত করিবার তিনটি অবস্থা আছে। যথা—

(১) যে ঔষধের চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার এক গ্রেন লইয়া একটি সুপরিষ্কৃত ওয়েজউড নির্মিত খলে রাখুন। উহার ভিতর ৩ গ্রেন দুগ্ধশর্করা দিয়া উত্তমরূপে স্প্যাচুলা দ্বারা মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে একটি ওয়েজউড নির্মিত মর্দক দ্বারা উহা ৬ মিনিট ধরিয়া চক্রাকারে জোরের সহিত মাড়িতে হইবে, ঐ সময়ের মধ্যে যেন ঐ মিশ্রণটুকু ভালরূপে মিশ্রিত হয়। ইহার পর ৩ মিনিট কাল স্প্যাচুলা দ্বারা খল ও মর্দক হইতে অণূসমূহ পৃথক করিতে হইবে। পরে এক মিনিট ধরিয়া ঐ মিশ্রণটুকু নাড়িতে হইবে। পুনরায় ৬ মিনিট ধরিয়া মর্দক দ্বারা মর্দন, ৩ মিনিট কাল স্প্যাচুলা দ্বারা খল ও মর্দক হইতে অণুসকল পৃথক করা এবং এক মিনিট ধরিয়া মিশ্রণ নাড়া—এইরূপে প্রথম অংশ প্রস্তুত হইতে ২০ মিনিট সময় ব্যয় হইল।

(২) পূর্বের ঐ প্রস্তুতীকৃত অংশে আরও ৩ গ্রেন দুগ্ধশর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রথমাংশের নিয়মানুযায়ী ২০ মিনিট ধরিয়া দ্বিতীয় অংশ প্রস্তুত করিতে হইবে।